গল্পগুলো
অন্যরকম

গল্পগুলো অন্যরকম

সমকালীন টীম

প্রথম প্রকাশ

আগস্ট ২০১৯

গ্রন্থস্বত্ব

লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ফটোকপি, মুদ্রণ, বই, ম্যাগাজিন বা পত্রিকায় প্রকাশ এবং অনুবাদ নিষিদ্ধ। গবেষণা, শিক্ষা বা সচেতনতার উদ্দেশ্য ব্যতীত বইয়ের অংশবিশেষ কোনো ব্যক্তিগত ব্লগ বা ওয়েবসাইটে প্রকাশ, ফাইল ট্রান্সফার, ই-মেইল অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

অনলাইন পরিবেশক

www.sijdah.com
www.rokomari.com
www.wafilife.com
www.alfurqanshop.com
www.oneummahbd.com

মুদ্রণ ও বাঁধাই

নুসরাহ পাবলিশিং সলিউশন : ০১৬১৪-১১১-০০০

ISBN: 978-984-93864-6-9

Published by Somokalin Prokashon, Dhaka, Bangladesh

Price : Tk. 290.00 US $ 30.00 only.

সমকালীন প্রকাশন

ইসলামি টাওয়ার (দ্বিতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা : ০১৬১৬-৬২৬-৬৩৬

সূচিপত্র

বোধ - আরিফ আজাদ ১১

চেরিফুল - আফীফা আবেদীন সাওদা ১৮

দ্বিতীয় বিয়ে - আনিকা তুবা ২৪

অশ্রুভেজা ডায়েরি - আফীফা আবেদীন সাওদা ৩০

সত্যিকারের মনস্টার - আলী আব্দুল্লাহ ৩৭

মায়ের দুআ - নুসরাত জাহান ৪৮

আঁধার মাঝে আলোর পরশ! - সিহিন্তা শরীফা ৫১

আমার যা আছে সবই তো আপনের লইগ্যা - শিহাব আহমেদ তুহিন ৬৩

আমি আবারও যাব - আরিফুল ইসলাম ৬৯

একটি তাওয়াক্কুলের গল্প - মাহমুদুল হাসান ৭৪

নতুন মেয়ে যাইনাব - আফিফা আবেদীন সাওদা ৮০

অনুশোচনা - আরমান ইবনু সোলায়মান ৮৯

জীবনসায়াহ্নে - আরিফ আজাদ ৯২

স্বপ্নেরা বেড়ে ওঠে - শারিন সফি অদ্রিতা ৯৬

এক চিলতে রোদ - সারওয়াত জাবীন আনিকা ১০২

রূপকথাও হেরেছিল - শিহাব আহমেদ তুহিন ১১১

এক টুকরো আলো - আফীফা আবেদীন সাওদা ১১৯

রুকাইয়া - মুরসালিন নিলয় ১২৪

মায়ের বিয়ে - যাইনাব আল-গাযী ১৩২

জাওয়াদ ও তার বাবা - নুসরাত জাহান ১৩৯

তোমায় ভালোবাসি - আরিফ আজাদ ১৪২

শূন্যতার মাঝেই পূর্ণতা - আনিকা তুবা ১৪৮

স্পেশাল অফার - জাকারিয়া মাসুদ ১৫১

এক চিলতে হাসি - সানজিদা সিদ্দীকা কথা ১৫৫

উমরাহ - সাদিয়া হোসাইন ১৬২

যা হারিয়ে পেয়েছি - আরিফ আবদাল চৌধুরী ১৬৭

পবিত্র প্রত্যাখ্যান - শেখ আসিফ ১৭৩

জীবনের ব্যাকরণ - আফীফা আবেদীন সাওদা ১৭৫

ভাবনার আধার - আনিকা তুবা ১৮১

মা - নুসরাত জাহান ১৮৫

এক বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যা - আরিফ আজাদ ১৮৭

অন্তর মম বিকশিত করো - আরিফ আবদাল চৌধুরী ১৯৪

অগ্রাধিকার - আফীফা আবেদীন সাওদা ১৯৮

পাঁচশ টাকা - আনিকা তুবা ২০৩

আকাশছোঁয়া আলো - মুরসালিন নিলয় ২০৬

বোধ

আরিফ আজাদ

[এক]

আজ সকাল সকাল বের হতে হবে শাওনকে। দুই জায়গায় দুটি শিডিউল দেওয়া আছে। প্রথমেই যেতে হবে গৌরিপুর হাসপাতালে। সেখানে মামুনের স্ত্রীকে ভর্তি করানো হয়েছে। ডেলিভারি কেইস। গতকাল রাত দেড়টায় মামুন ফোন করে জানিয়েছে, তার স্ত্রীর রক্ত লাগবে। তাও খুব সকাল সকাল। ফোনে মামুন পারলে তো কেঁদেই ফেলে। বারবার বলতে লাগল, 'দোস্ত, আসবি তো? বল না রে! সত্যি সত্যিই কি আগামীকাল আসবি হাসপাতালে? তোর ভাবির খুব ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশান যাচ্ছে। তুই ছাড়া এমন কেউ নাই যে আগামীকাল ভোরে এসে রক্ত দিতে পারবে। প্লিজ দোস্ত, কথা দে আসবি?'

এমনিতে ফোনের রিংটোন বেজে ওঠায় ঘুম ভেঙে গেছে শাওনের। তার ওপর মামুনের এরকম ন্যাকা-কান্না শুনে তার সত্যিই রাগ লাগছিল। ভন ভন করে মাথা ঘুরতে লাগল। ফোনের ওপাশে মামুনের নাক্যামো মার্কা কান্না যেন থামছেই না। একপর্যায়ে শাওন বিরক্ত হয়ে বলল, 'থামবি তুই? এক কথা আর কতবার বলবি? বললাম না আসব। এক কথা কি হাজারবার বলা লাগে?'

শাওনের একপ্রকার ধমক শুনে একটু থামল মামুন। বলল, ‘দোস্ত, রাগ করিস না। ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশানে পড়েই তোর কাছে ধরনা দিয়েছি। তাছাড়া আমার হাতে যদি আরও কয়েকটি অপশান থাকত তাহলে তোকে এভাবে জ্বালাতাম না আমি। বিশ্বাস কর।’

শাওন রাগতস্বরে বলল, ‘বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কিছু নেই। তোকে বলেছি তো—আগামীকাল ভোরেই আমি হাসপাতালে থাকব–অন দ্য টাইম। এরপরও তুই বারবার বলে যাচ্ছিস—আসবি তো-আসবি তো? বিরক্তি লাগে না বল?’

মামুন চুপ মেরে গেল যেন। দুই প্রান্তেই নীরবতা। নীরবতা ভেঙে শাওন বলল, ‘টেনশন করার কিছু নেই। আমি আগামীকাল খুব ভোরে উপস্থিত থাকব। বুঝেছিস?’

মামুন খুব ধীর-গলায় বলল, ‘ধন্যবাদ দোস্ত।’

শাওন অতটা সময়ের অপেক্ষা করেনি। ফোনের লাইন কেটে দিয়ে শুয়ে পড়েছে।

অন্য শিডিউলটি ক্যাম্পাসের। আজ ডিপার্টমেন্টাল প্রোগ্রাম আছে। প্রোগ্রামের সব দায়-দায়িত্ব চেপেছে শাওনের কাঁধেই। মোটামুটি রকমের একটি ঝামেলায় পড়ে গেল সে। দুটি-ই ইমার্জেন্সি এবং সমান গুরুত্বপূর্ণ। বের হওয়ার পথে শাওনের মা ডাক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘এত তাড়াতাড়ি তো কখনোই যাস না। আজ যাচ্ছিস যে?’

শাওন ঘাড় বাঁকিয়ে উত্তর দিল, ‘কখনোই যাই না বলে যে আজ যেতে পারব না—এমন কোনো ব্যাপার আছে নাকি?’

ছেলের উত্তর শুনে শাওনের মা চুপ মেরে গেলেন একদম। তিনি খুব ভালো করেই জানেন তার ছেলে কোনোদিন সোজা কথার সোজা উত্তর দেয় না। তাকে যখন মাছের কাঁটা বেছে মাছ খেতে দেওয়া হতো সে প্লেট ঠেলে দিয়ে বলত, ‘কাঁটার জন্য মাছ খাবো না, তা তো বলিনি। মাছ খাবো না বলেছি—কারণ, মাছ খেতে আমার ভালোলাগছে না, তাই। শুধু শুধু বাড়তি যত্ন-আত্তির আমাকে করতে এসো না প্লিজ। বিরক্তি লাগে।’

ছেলের এমন অদ্ভুত আচরণে খুব আহত হন রাহেলা বেগম। বাপ-মরা একমাত্র ছেলে তার। কত স্বপ্ন তাকে ঘিরে! কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে ছেলেটির এমন অদ্ভুত স্বভাবের কারণে রাহেলা বেগমের চোখের জল ফেলতে হয়। স্বামী আযহার উদ্দীনের স্বপ্ন ছিল ছেলেকে আলেম বানাবেন। শাওনের যখন সাড়ে তিন বছর

বয়স তখন থেকেই তাকে নিয়ে রোজ মসজিদে চলে যেতেন আযহার উদ্দীন। ছেলেকে পাশে দাঁড় করিয়ে সালাত আদায় করতেন তিনি। এত ছোট্ট বাচ্চাকে মসজিদে আনতেন বলে অন্য মুরব্বি-মুসল্লীরা প্রায়ই দু-চারটি কথা শোনাতেন আযহার সাহেবকে; কিন্তু তাতে একেবারেই পাত্তা দিতেন না তিনি। তার একটাই কথা ছিল—ছোট বাচ্চারা ছোটবেলায় যা শেখে সেটি তারা সবসময় মনে রাখতে পারে। মসজিদে আসা শিখলে বড় হয়েও মসজিদে আসবে।

আযহার উদ্দীনের এই চিন্তা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। বাবার হাত ধরে খুব ছোট বেলাতেই মসজিদে আসা-যাওয়া করা ছেলেটি বড় হয়ে একেবারে মসজিদমুখী হয় না বললেই চলে। বাবার শেখানো সব বিদ্যে সে ভুলে বসে আছে। অল্প বয়সে বাবাকে হারিয়ে একেবারে বখে গেছে সে। অথবা হতে পারে অবাধ স্বাধীনতাই তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাহেলা বেগম প্রায়ই বিড়বিড় করে বলেন, ‘অতিরিক্ত স্বাধীনতাও একরকম পরাধীনতা।’

পায়ে মোজা পরতে পরতে শাওন বলল, ‘দুপুরে খাব না। ফোন করো না।’

রাহেলা বেগম জানতে চাইলেন ‘খাবি না কেন? কোথায় খাবি তাহলে?’

মায়ের দিকে অগ্নিদৃষ্টি দিল সে। তার চোখ থেকে যেন আগুনের ফুলকি বের হচ্ছে। খুব কঠিন চেহারায় বলল, ‘জাহান্নামে খাব, বুঝতে পেরেছ? কতবার বলেছি আমার ব্যাপারে বেশি নাক গলাতে আসবে না। যখন বলেছি খাব না, তখন খাব না, ব্যস। ফারদার প্রশ্ন করে জানতে চাইবে না—কেন খাব না, কোথায় খাব ইত্যাদি ইত্যাদি...।’

রাহেলা বেগম দ্বিতীয়বারের মতো চুপ মেরে গেলেন। ছেলের এমন স্বভাবের সাথে তিনি আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। আগে সে এরকম ব্যবহার করলে তিনি জায়গাতেই চোখের পানি ছেড়ে দিতেন। টপটপ করে তার চোখের জল গড়িয়ে পড়ত মাটিতে। এখন চোখ আর মন—দুটি-ই কেমন যেন শক্ত হয়ে গেছে। অথবা হতে পারে সময়ের সাথে সাথে সয়ে নিয়েছে এগুলো। এখন আর এসব দেখে মনের ভেতরে হাহাকার হয় না। বুক ফেটে কান্না আসে না। মাঝে মাঝে আল্লাহর কাছে নিজের মৃত্যু চাইতে মন চায়। কিন্তু হাদীসে নিজের মৃত্যু চাইতে নিষেধ করা হয়েছে বলে তিনি ধৈর্য ধরে আছেন।

শাওন যখন বের হতে যাবে তখন তিনি আবার বললেন, ‘যদি একটু সময় দিতি তাহলে টিফিন ক্যারিয়ারে হালকা কিছু নাস্তা দিয়ে দিতাম। তোর জন্য ভোর থেকেই শীত-পিঠা বানাচ্ছিলাম।’

কিছুই বলল না সে। শুনতে পায়নি—এমন ভাব করে বাসা থেকে বেরিয়ে গেল। তার চলে যাওয়ার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন রাহেলা বেগম। তার মনে পড়ে যায় অতীতের কথা। শাওন যখন তার বাবার সাথে মসজিদে যাওয়ার জন্য অথবা স্কুলে যাওয়ার জন্য বের হতো তখন সে বারবার পেছন ফিরে মায়ের দিকে তাকাত। হাত নেড়ে মুচকি হেসে মাকে বিদায় জানাত। দরজার আড়াল থেকে তিনিও হাত নেড়ে ছোট্ট সোনামণিটাকে বিদায় দিতেন। মা-ছেলের চোখে-চোখে কথা হতো। সেই ছেলে আজ এরকম অবাধ্য উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়বে—তা রাহেলা বেগম স্বপ্নেও ভাবেননি।

[দুই]

শাওন কথা রেখেছে। নির্ধারিত সময়ের আগেই সে হাসপাতালে এসে পৌঁছেছে।

গৌরিপুর হাসপাতাল। রোগীদের আসা-যাওয়া এবং চিৎকার-চেঁচামেচিতে গমগম করছে পুরো হাসপাতাল এলাকা। শাওনকে দেখে একরকম দৌড়ে এলো মামুন। চেহারায় বিষণ্ণতার ছাপ। চিন্তা আর অস্থিরতায় শুকিয়ে যেন কাঠ হয়ে গেছে সে। হাঁপাতে হাঁপাতে এসে শাওনকে বলল, ‘থ্যাঙ্ক ইউ দোস্ত। অনেক বড় উপকার করলি আজ’। মামুন আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। তাকে থামিয়ে দিয়ে শাওন বলল, ‘তোর বউয়ের কী অবস্থা বল।’

‘অবস্থা তো ক্রিটিক্যাল। খুবই ব্লিডিং হয়েছে। এজন্যই ব্লাড লাগছে।’

‘ব্লাড কখন নেওয়া হবে?’ জানতে চাইল শাওন।

‘একটুপরেই।’

‘আচ্ছা’ বলেই থেমে গেল শাওন। শাওনের যে অন্য আরেক জায়গায় যাওয়ার তাড়া আছে ব্যাপারটি মামুনকে জানানো দরকার মনে করল না সে। বিপদগ্রস্ত মানুষের কাছে বাকি পৃথিবীটাই গৌণ।

ব্লাড দেওয়া শেষে শাওন হাসপাতালের বারান্দায় ফিরে এলো। তাকে দেখে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কান্না জুড়ে দিল মামুন। শাওনের আজকের উপকারের কথা সে কোনোদিন ভুলবে না, এই প্রতিদানের ঋণ কোনোভাবেই শোধ করতে পারবে না

সে—ইত্যাদি বাক্য বলতে বলতে শিশুর মতোই কাঁদতে লাগল সে। তার কান্না দেখে আশেপাশের লোকজনও ফিরে তাকাচ্ছে ওদের দিকে। হালকা বিব্রত হচ্ছে শাওন; কিন্তু এই মুহূর্তে মামুনকে থামিয়েও দেওয়া যাচ্ছে না। শাওন বলল, 'আমার একটু তাড়া আছে। আমি তাহলে আসি এবার।'

তার চলে যাওয়ার কথা শুনেই মামুন বলল, 'চলে যাবি মানে? আমার সন্তানের মুখ দেখে যাবি না?'

শাওন খেয়াল করল সন্তানের কথা বলতে গিয়ে অদ্ভুতরকম পাল্টে গেল মামুনের চেহারা। বিষণ্ণতায় নুইয়ে পড়া মুখাবয়বে হঠাৎ আনন্দের ঝিলিক খেলে গেল। মামুনকে এরকম উৎফুল্ল দেখে শাওন জানতে চাইল 'সন্তানের জন্য খুব অধীর অপেক্ষায় আছিস বলে মনে হচ্ছে?'

হেসে ফেলল মামুন। তাকে দেখে বোঝাই যাবে না যে, সে একটু আগে হাউমাউ করে কেঁদেছে। বলল, 'সন্তান যে কী-জিনিস তা বাবা হওয়ার আগ পর্যন্ত কোনোদিন বুঝবি না।'

শাওন চুপ করে রইল। ভাবতে লাগল তার বাবার কথা। সে যেদিন পৃথিবীতে আসে সেদিন কি তার বাবাও এরকম অধীর আগ্রহে প্রহর গুনেছে সারাক্ষণ? বাবার স্মৃতি আবছা-আবছা মনে করতে পারে সে। সেই আবছা স্মৃতির সবটুকুজুড়ে আছে বাবার আদর। বাবা তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে ঘুরতেন। বাবার বুকের ওপরে ঘুমিয়ে পড়ার কথাও কিছুটা মনে পড়ে তার। বাবার হাত ধরে স্কুলে যাওয়া, আইসক্রিম খেতে খেতে বাসায় ফেরা—সবকিছু যেন স্মৃতির অতল গহ্বর থেকে হঠাৎ বের হয়ে আসতে চাইছে...

শাওন বলল, 'ভাবিও কি তোর মতোই উদগ্রীব সন্তানের জন্য?'

আবার হেসে উঠে মামুন বলল, 'কী যে বলিস! বাবার চেয়ে একজন মা-ই তার সন্তানের জন্য সবচেয়ে বেশি উদগ্রীব থাকে। দশ-দশটি মাস পেটের ভেতরে অসহ্য সব যন্ত্রণা সহ্য করে বড় করে তোলে সন্তানকে। ভাবতে পারিস, কতটা ত্যাগ থাকে তাতে? একবার কী হয়েছে জানিস? আমার স্ত্রী একদিন আমাকে বলল, 'যদি সন্তান জন্মের সময় অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, হয় সন্তান বাঁচবে না-হয় মা; তখন কিন্তু তুমি আমার কথা মোটেই মাথায় আনবে না। আমার সন্তানই যেন আমার ওপরে প্রাধান্য পায়। আমি না থাকলেও সে যেন বেঁচে থাকে এই পৃথিবীর আলো-বাতাসে। সেদিন তার কথাগুলো শুনে আমার কান্না চলে এসেছিল।'

শাওন শুনল কথাগুলো। একজন মা তার সন্তানকে এতটা ভালোবাসে? এতটাই ভালোবাসে যে, নিজের জীবন বিপন্ন করে সন্তানের কথা ভাবতে পারে? অথচ ওই সন্তানের চেহারা পর্যন্ত দেখেনি তখনো। সে আবার ভাবনার জগতে হারিয়ে যায়। 'আচ্ছা, আমার মা-ও কি আমার আগমনের সময় এমন উদগ্রীব ছিলেন? আমাকেও তো তিনি দশ-মাস পেটে রেখেছেন। সহ্য করেছেন অসহনীয় সব যন্ত্রণা। আচ্ছা, তখন বাবাকে ডেকে আমার মা-ও কি এমন করে বলেছিলেন? সেই কঠিন মুহূর্তে আমিও কি তার কাছে তার জীবনের চেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়েছিলাম?'

কল্পনায় ছেদ পড়ল শাওনের। পাশের অপারেশান থিয়েটার থেকে উচ্চৈঃস্বরে ভেসে আসছে এক নবজাতকের চিৎকার-কান্না। এই কান্নায় বুকটা হয়তো ধড়ফড় করে উঠল মামুনের। সে এক ভোঁ-দৌড়ে চোখের পলকে চলে গেল ওদিকে। মামুনকে এমন পাগলের মতো ছুটতে দেখে খানিকটা অবাক হয় শাওন। সাদা পোশাক পরা একজন নার্স অপারেশান থিয়েটার থেকে বের হয়ে মামুনকে বলল, 'মামুন সাহেব, আপনার মেয়ে হয়েছে।'

মামুনের খুশি আর দেখে কে; খুশিতে সে উচ্চ আওয়াজে কয়েকবার 'আলহামদু লিল্লাহ' বলে উঠল। হাসপাতালে কিছু আত্মীয়-স্বজনও এসেছিল ইতোমধ্যে। কাছে যাকে-ই পাচ্ছিল—তাকেই আনন্দে জড়িয়ে ধরছিল মামুন। সন্তানের জন্য মামুনকে এমন উৎফুল্ল দেখে শাওনের ভেতরে এক নতুন অনুভূতির সৃষ্টি হয়। সেই অনুভূতি শাওনকে চমকিত করে, ভাবিত করে।

[তিন]

বাইরে বেরিয়ে এলো শাওন। সকালের সোনা-রোদ এখনো মিলিয়ে যায়নি। এই মুহূর্তে তার ক্যাম্পাসে চলে যাওয়ার কথা। কিন্তু কোনো এক কারণে আজকে তার ক্যাম্পাসে যেতে মন চাইছে না কোনোভাবেই। তার স্মৃতিতে শুধু ভেসে উঠছে তার বাবার আবছা চেহারা। মনে পড়ছে মায়ের কথা। আজ সকালেও মাকে সে শাসিয়েছিল। প্রতিদিনই এমন আচরণ করে সে তার মার সাথে। কেন জানি তার ভেতরে খুব অপরাধবোধ কাজ করছে। তার মন চাচ্ছে মাকে গিয়ে জড়িয়ে ধরতে। জড়িয়ে ধরে মামুনের মতো হুহু করে কাঁদতে পারলে তার ভালোলাগত হয়তো...

[চার]

ঠক... ঠক... ঠক...

দরজা খুলে দিলেন রাহেলা বেগম। দরজার সামনে শাওনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি বেশ অবাকই হলেন। ওর তো আসার কথা ছিল না এখন। কোনো সমস্যা হয়েছে কি? রাহেলা বেগম খেয়াল করলেন, শাওন তার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার সেই দৃষ্টিতে কোনো বিরক্তি নেই। কোনো তাচ্ছিল্য নেই। ছেলের চোখের এই চাহনির সাথে রাহেলা বেগম খুব অপরিচিত। ছেলের কোনো বিপদ হয়েছে কি না—এমন এক অজানা শঙ্কায় কেঁপে উঠল তার বুক।

হঠাৎ মায়ের পায়ে লুটিয়ে পড়ল শাওন। রাহেলা বেগমের পা দুটি জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে সে কাঁদতে আরম্ভ করল। খুব অবাক হয়ে গেলেন রাহেলা বেগম। ছেলের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে জিজ্ঞেস করেন তার কী হয়েছে? এমন করছে কেন? কোনো সমস্যা হয়েছে কি না...

শাওন কিছুই বলছে না। শুধুই কাঁদছে। শিশুদের মতো মায়ের গলা জড়িয়ে কাঁদতে থাকা শাওনকে আদর করে গালে চুমু খায় রাহেলা বেগম। তিনি বুঝতে পারেন শাওনের বোধ জেগেছে। একপ্রকার হারিয়ে যাওয়া ছেলেকে তিনি আবার ফিরে পেয়েছেন। রাহেলা বেগমের ইচ্ছে করছে এই মুহূর্তে জায়নামায বিছিয়ে দুআ করতে। কেননা, ছেলেকে নিয়ে এভাবেই তার হাজার বছর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে হয়...

চেরিফুল

আফীফা আবেদীন সাওদা

[এক]

শীতের সকাল। উইন্টারব্রুকের তুষার-ভেজা রাস্তায় লোকজন নেই বললেই চলে। গোটা পাড়া ঘুমিয়ে আছে। হিম-শীতল ঠান্ডা বাতাসে অদ্ভুত এক ছন্দ তুলে তিরতির করে কাঁপছে জাপানি চেরি গাছের পাতা। তারই ধার ঘেঁষে হেঁটে যাচ্ছিলাম খুব সতর্কতায়। তুষার-গলা পিচ্ছিল রাস্তায় বেরসিক জুতো জোড়া প্যাচপ্যাচ আওয়াজ তুলছে। এই বুঝি জেগে গেল ঘুমন্ত উইন্টারব্রুক!

এ এলাকায় এই আমার প্রথম আসা। হোম নার্সিং এজেন্সিতে চাকুরিটা হয়ে যাবার পর প্রথম কাজ পেলাম উইন্টারব্রুকে। আলঝাইমার্স রোগীর দেখাশোনা করতে হবে। রোগীর নাম আহমাদ জোন্স। রেকর্ড ঘেঁটে দেখলাম আশি বছরের এই বৃদ্ধ কনভার্টেড মুসলিম। বাপ-দাদার ধর্ম ছেড়ে ইসলাম পালন করছেন প্রায় বছর-চল্লিশ হলো।

মুসলিমদের নিয়ে জানাশোনা ছিল না আমার। সত্যি বলতে কোনো ধর্ম সম্পর্কেই শিক্ষা-দীক্ষা পাইনি আমি। মনের গহীন থেকে কেউ বলে একজন স্রষ্টা তো নিশ্চয়ই আছে। আমি তাতে সায় দিয়েছি বটে, তবে স্রষ্টাকে খোঁজার চেষ্টা করিনি। গহীনের আওয়াজ গহীনেই ধামাচাপা পড়ে আছে তেইশটা বছর।

এর মাঝে একজন মুসলিম রোগী পেয়ে খানিকটা চিন্তায় পড়ে গেলাম। তিন বছর বয়সে মা-বাবাকে হারিয়েছি। আমাদের, মানে আমার আর ছোট ভাই পিটারের ঠাঁই হয়েছিল তখন নানাবাড়িতে। চারপাশে যাকেই পেয়েছি, খ্রিস্টান। কখনো জানা হয়নি—মুসলিমদের রীতিনীতি কেমন ছিল। রোগীর চিকিৎসার সুবিধার্থে একটু-আধটু পড়াশোনা করলাম। জানতে পারলাম মুসলিমরা শূকরের গোশত খায় না, মদ ছুঁয়েও দেখে না। দোকান থেকে আহমাদ জোন্সের জন্য হালাল গোশত কিনেছি তাই। তাকে নিয়ে আমার উদ্বেগে কলিগরা অবাক। তাদের কথা এ রোগী তো আলঝাইমার্সের একদম এডভান্সড স্টেজে চলে গেছে। মাঝে মাঝে নিজেকেই চিনতে পারে না। তার ধর্মীয় রিচুয়াল নিয়ে এত ভাববার কী আছে?

ওদের কথায় আহত হয়েছিলাম খুব। একটা মানুষ স্মৃতিভ্রষ্ট বলে কি তার বিশ্বাস নিয়ে খেলা যায়? বারবার আমার নানীর মুখটা ভেসে উঠছিল। শেষ সময়ে তারও আলঝাইমার্স হয়েছিল। আমাকে আর পিটারকে যখন চিনতে পারতেন না, তখন কী যে কষ্ট লাগত! একদম শিশুর মতোন হয়ে যেতেন আমার নানী। যে-শিশু বলতে পারে না তার ক্ষিদে পেয়েছে, বুঝতে পারে না তাকে বাথরুমে যেতে হবে। স্মৃতি ফিরলে নানী একদম স্বাভাবিক মানুষ। আমাকে আর পিটারকে চোখে হারাতেন। এই মানুষটা যদি জানতেন এমনও দিন গেছে যেদিন তার কাছে আমি আর পিটার ছিলাম অচেনা আগন্তুক, তিনি কি মেনে নিতে পারতেন? মনে হয় পারতেন না।

আহমাদ জোন্স আমার নানীর রোগে ভুগছে। দেখার আগেই মায়া পড়ে গেছে লোকটার জন্য। আজ তার বাড়িতে গিয়েই হালাল বিফের স্ট্যু বানাব। প্রথমে তার আস্থা অর্জন করা চাই। সে যেন না-ভাবে আমার কাছে তার ধর্মীয় অনুভূতি অনিরাপদ। প্রয়োজনে চিকিৎসা পদ্ধতি পালটে নিব, তবু তার ধর্মের সাথে সংঘাতে যাব না।

সারবাঁধা চেরিফুলের গাছ পেরিয়ে রাস্তা যেখানে বামে বাঁক নিল, সেখানেই আহমাদ জোন্সের বাড়ি। লাল টালি দেওয়া ছাদের রঙটা জ্বলে গেছে। বাইরে থেকে বাড়ির দুরাবস্থা দেখে যা ভেবেছিলাম, ভেতরটা তেমন নয়। আমি ঢুকতেই বাতাসে দড়াম করে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ইজি চেয়ারে বসা বৃদ্ধ চোখ খুললেন।

‘জেসিকা! তোমাকে বলেছি না এত আওয়াজ করে দরজা লাগাবে না।’

রোগীর হিস্ট্রি মোটামুটি মনে ছিল আমার। জেসিকা তার মেয়ের নাম। মারা গেছে বছর দেড়েক হলো।

রুম-হিটারের উষ্ণতায় গরম কাপড়ের প্রয়োজন নেই। গায়ের ওভারকোটটা খুলে সোফার একপাশে রাখলাম। বৃদ্ধের কাছে গিয়ে জানালাম আমি ক্যাসি, তার দেখাশোনা করতে এসেছি।

বৃদ্ধ জোন্স কী বুঝলেন কে জানে, আবার চোখ বন্ধ করে চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। আমিও চলে গেলাম রান্নাঘরে। দ্রুত বিফ বের করে মশলাপাতি দিয়ে চুলায় চাপালাম।

জোন্সকে স্ট্যু খাওয়াতে একটু বেগ পেতে হলো। আমি বাঁ-হাতি। তাকে খাওয়াতে বারবার চামচটা বাম হাতে নিয়ে নিচ্ছিলাম। আর জোন্স কেবল ইশারায় ডান হাত দেখিয়ে দিচ্ছিল। আন্দাজ করে নিলাম এভাবেই মুসলিমরা খায়। বাম হাতে খাওয়া নিষেধ।

দুপুরে সাক্ষী হলাম এক অদ্ভুত ঘটনার। বৃদ্ধ ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে কী এক অচেনা ভাষা আওড়াচ্ছেন। খানিক বাদে দুই হাঁটু ধরে উবু হয়ে গেলেন। এরপর আবার দাঁড়িয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। অনেকটা ব্যায়ামের মতো, সাথে ভিনদেশি ভাষা। বিকেলে আবারও সেই একই কাজ। পরপর দুই দিন নিয়ম করে এমনটাই করে যাচ্ছেন তিনি। তা-ই নিয়ে কলিগের সাথে কথা বললাম। সে বলল, কোনো মুসলিমের সাথে সরাসরি কথা বলতে। কথায় কথায় এক চ্যাটরুমের সন্ধান পেলাম। সেখানে ধর্ম নিয়ে আলোচনা চলে।

সেই চ্যাটরুম থেকে জানতে পারলাম আহমাদ জোন্স ভিনদেশি ভাষায় যে-ব্যায়ামটা করেন, তা নিছক কাউকে দেখে শেখা নয়। সেটা ছিল মুসলিমদের প্রার্থনা। বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল ভীষণ। যে-মানুষটা নিজের হাতে ঠিকমতো খেতে পারে না, নিজের পরিবারের কথাও ভুলে গেছে, সে ঠিক-ঠিক প্রার্থনা করে যাচ্ছে তার স্রষ্টার কাছে!

সেদিনই বুঝে গিয়েছিলাম তাকে ভালো রাখার উপায়। একমাত্র ইসলামই তার কষ্ট লাঘব করতে পারে! ইসলাম নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি বাড়িয়ে দিলাম। চ্যাটরুমে একজন আমাকে তাদের ধর্মগ্রন্থ কুরআনের অনুবাদ পড়তে দিল। সেখান থেকে সূরা আন-নাহল যে কতবার পড়লাম! বারেবারে থমকে গিয়েছি এখানে—

কাজেই যিনি সৃষ্টি করেন, তিনি কি তার মতো, যে সৃষ্টি করে না? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?[১]

[১] সূরা নাহল, আয়াত : ১৭।

যতবার পড়ি হৃদয় ভেঙেচুরে আসে। সৃষ্টি আর স্রষ্টা সমান হতে পারে না! ভেতর থেকে তাগিদ আসে স্রষ্টাকে খুঁজে নেওয়ার। ধামাচাপা দেওয়া বোধগুলো জ্বালাতন করে খুব।

আমি এক মনে কুরআন পড়ে যাই। আইপডে তিলাওয়াত শুনি। জানি না কেন চোখ বেয়ে অশ্রু নামে।

দিনকে দিন কুরআন আমার কাছে বিস্ময়কর এক গ্রন্থ হয়ে ধরা দিচ্ছে। বৃদ্ধ জোন্স কুরআন শুনলে খুশি হয়, কখনো কাঁদে। অর্থ পড়ে আমিও বুঝে নিই কেন হাসে, কেনই বা কাঁদে। এই ভদ্রলোকের বাড়িতে পা রাখার আগের দিনটা পর্যন্ত আমি ভাবতাম—আমি সুখী, আমার হৃদয় পরিতৃপ্ত। জরাগ্রস্ত আহমাদ জোন্স আমার ভাবনা বদলে দিয়েছে। জীবনসায়াহ্নে এসেও তার চোখে-মুখে প্রশান্তির ছাপ ভুল প্রমাণ করে দিয়েছে আমায়। সেই প্রশান্তি আমারও চাই। জানি না—কীসের জন্য প্রাণটা আকুল হয়ে থাকে। ভীষণ খালি খালি লাগে। বারেবারে মনে হয় কী যেন নেই, কী যেন নেই!

[দুই]

চ্যাটরুমে আজকাল বেশিই সময় ব্যয় করি। রোগীর জন্য ইসলামকে জানতে গিয়ে কখন যে নিজের জন্যই জানতে শুরু করেছি, টেরই পাইনি। এখানে সবাই সাহায্য করতে তৎপর। আমাকে স্থানীয় মসজিদগুলোর একটা লিস্ট দেওয়া হলো। সেই লিস্ট ধরে একটা মসজিদে গেলাম।

দিনটার কথা জীবনে ভুলব না আমি। মসজিদে পা রাখতেই সমস্বরে আল্লাহু আকবার ধ্বনি! আল্লাহু আকবার—আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ! কী যে এক অজানা অনুভূতি! স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থেকেও কোথায় যেন ভেসে যাচ্ছি আমি। সত্য-মিথ্যা যা-কিছু মিলেমিশে একাকার ছিল, তার সবটা আমার সামনে দু'ভাগ হয়ে ধেয়ে আসছে। যেন বলছে, কোন দিকে যাবে তুমি? টালমাটাল আমি চোখভরা জল নিয়ে মুসলিমদের সালাত দেখলাম। দেখলাম, একদল মানুষ স্রষ্টার কাছে নিজেকে সঁপে দিচ্ছে।

মসজিদের ইমামের সাথে কথা হলো। সখ্য হলো তার স্ত্রীর সাথে। তারা আমাকে কিছু বই দিলেন, আর কিছু অডিও লেকচার।

ইসলাম নিয়ে যা-কিছু জানার ছিল, জেনে নিতে লাগলাম চ্যাটরুম থেকে, কখনো মসজিদ থেকে। ধীরে ধীরে এমন একসময় চলে এলো, যখন ইসলামকে আঁকড়ে

ধরা ছাড়া আমার আর কোনো গত্যন্তর নেই।

এক সন্ধ্যায় সেই চ্যাটরুমে গেলাম আবার। মাইক্রোফোনে একজন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

'ক্যাসি, তোমার কি কোনো প্রশ্ন আছে?'

'না।'

'আমি কি জানতে পারি—কোন বিষয়টা তোমাকে ইসলামগ্রহণে বাধা দিচ্ছে?'

জবাব দিতে পারলাম না আমি। পরদিন ফজরের সালাত দেখতে মসজিদে চলে গেলাম। ইমামও চ্যাটরুমের সেই ভাইটির মতো একই প্রশ্ন করলেন। কী আমাকে বাধা দিচ্ছে? কী নিয়ে এত দোটানায় আমি? এবারও নিরুত্তর আমি।

চুপচাপ চলে এলাম আহমাদ জোন্সের কাছে। তাকে খাওয়াতে বসলাম। জবুথবু হয়ে ভদ্র ছেলের মতো খেয়ে নিচ্ছেন তিনি। তার শান্ত চোখের তারায় আমার প্রতিচ্ছবি। সে-ছবিতে নিজেকে পড়ে ফেললাম যেন! আমি ভয় পাচ্ছি...আল্লাহর কাছে নিজেকে সঁপে দিতে ভয় পাচ্ছি! কোনো অজানা আশংকায় নয়, সত্যকে আলিঙ্গান করতে ভয় পাচ্ছি আমি! আমি কি এর যোগ্য? এই বৃদ্ধ মানুষটার মতো প্রশান্ত হৃদয় কি আমার প্রাপ্য?

বিকেলে আবার গেলাম মসজিদে। শান্ত স্বরে ইমামকে জানালাম শাহাদাহ নিতে চাই। উচ্চারণ করলাম সেই অমোঘ বাণী—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল।

ভেতর থেকে বোঝা নেমে গেল, এখন আমি মুসলিম! মনে হচ্ছিল ছোট্ট অন্ধকার এক গুহায় বন্দি ছিলাম আমি। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতে বলতেই গুহামুখের পাথর সরে যেতে লাগল, আর আমি বুক ভরে শ্বাস নিলাম!

মসজিদ থেকে আহমাদ জোন্সের বাড়ির পথ ধরেছি। তাকেই আগে জানাব আমার ইসলাম গ্রহণের কথা। এরপর পিটারকে। এখনো জানি না, সে কীভাবে নেবে। আশা রাখি পাশেই থাকবে আমার।

উইন্টারব্রুকের রাস্তাটা নতুন করে দেখছি। প্রথম যেবার এসেছিলাম, তখন শীতকাল। শীত পেরিয়ে এখন বসন্তের মাঝামাঝি। ন্যাড়া রেডউড গাছটাতে পাতা এসেছে। ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে জাপানি চেরিগাছগুলো।

চেরিফুল কী অদ্ভুত সুন্দর! সাদাটে ফুলে হালকা গোলাপি আভা। এর মাঝে লাল রঙা রেণু দেখলে ভ্রম হয়। যেন আচমকা উথলে উঠেছে ফুলের বুক চিরে।

চেরিফুলের মিছিলে হাঁটছি আর ভাবছি। গেল শীতেও আমি ছিলাম পথহারা। মাস কতকের ব্যবধানে জীবন কেমন করে বদলে গেল! মনের গহীনে ধামাচাপা দেওয়া সত্যটা ছলকে বেরিয়ে এলো যেন! ঠিক চেরিফুলের রেণুর মতো। একদম হুট করে, আচমকা![১]

[১] গল্পটি একজন নওমুসলিমের ইসলামগ্রহণের সত্য কাহিনি অবলম্বনে লেখা।

দ্বিতীয় বিয়ে

আনিকা তুবা

[এক]

‘দ্বিতীয় বিয়ের ব্যাপারে ভাবছি...’

‘কিন্তু কেন? আমি কি খুব খারাপ? আমি কি যথেষ্ট ভালো নই? না, না! আমি কখনোই দ্বিতীয় বিয়ে মানতে পারি না। আপনাকে আরেকজন নারীর সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে পারি না। আপনি চাইলে, আরেকটি বিয়ে করতে পারেন। তবে মনে রাখবেন, দ্বিতীয় স্ত্রী ঘরে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমি ঘর ছেড়ে চলে যাবো।’

এই তো, কয়েক বছর আগে যখন স্বামীর মুখে শুনেছিলাম, তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করতে আগ্রহী তখন প্রেম ও আবেগ-তাড়িত হয়ে ঠিক এ কথাগুলোই বলেছিলাম। আমার এই জোরালো প্রতিবাদের প্রেক্ষিতে তিনি কেবল এতটুকু বলেছিলেন, ‘ভোগ নয়; মানবতাবোধে তাড়িত হয়েই দ্বিতীয় বিয়ের কথা ভাবছি। যাকে আমি বিয়ে করতে চাচ্ছি, তিনি ষোড়শী কিংবা ধনীর দুলালি নন; বরং সদ্য-তালাকপ্রাপ্তা চার সন্তানের জননী। ছেলে-মেয়ে নিয়ে খুব কষ্টে তার দিন কাটছে। তার অবস্থা এখন এতটাই শোচনীয় যে, রাত পোহালে মনে হয়, রাতটা আরেকটু দীর্ঘ হলেই ভালো হতো। বাচ্চারা ক্ষুধার যন্ত্রণা ভুলে আরেকটু সময় ঘুমিয়ে থাকত। আর রাত হলে মনে হয়, ভোরের আলো ফুটলেই হয়তো ভালো হতো, বাচ্চাগুলোর জন্য দু’মুঠো খাবারের হয়তো ব্যবস্থা করা যেত।’

আমি বললাম, 'কেন? ওদের বাবা কী করে? সে কি বাচ্চাদের দায়িত্ব নিতে পারে না? তাদের দেখাশোনা করতে পারে না? সে নিজেই যদি তার দায়িত্ব পালন না করে, তবে আপনি কেন বাইরের মানুষ হয়ে তার বোঝা বইতে যাবেন? তাছাড়া আপনি যদি তাকে কেবল সাহায্যই করতে চান, তবে বিয়ে করা ছাড়াও সেটা করতে পারেন। তার আর্থিক ব্যয়ভার বহন করতে পারেন। তার জন্য আবাসন বা কর্মসংস্থান করে দিতে পারেন। সাহায্যের এতগুলো সুযোগ থাকতেও বিয়েই কেন করতে হবে?'

বহুবিবাহ মেনে নেওয়ার ব্যাপারটি আমি কল্পনাও করতে পারি না—'আমার স্বামীকে আরেকজন নারীর সাথে ভাগাভাগি করতে হবে, আমার প্রতি তার অখণ্ড ভালোবাসাকে খণ্ডিত করে আরেকজন নারী সেটা উপভোগ করবে; আমাকে ছাড়াও তিনি আরেকজন নারীকে স্পর্শ করবেন এবং তাকে ভালোবাসার চাদরে জড়িয়ে স্বপ্নের জাল বুনবেন—অসম্ভব! এটা কিছুতেই হতে পারে না। এটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না।'

এগুলো ভাবতেই চরম ক্ষোভ, দুঃখ ও অপমানের জ্বালায় আমি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিলাম। আমি তার জন্য কী করিনি? স্ত্রী থেকে শুরু করে প্রেমিকা, সেবিকা, মা, ডাক্তার, গৃহিণীসহ—আরও কতজনের ভূমিকা পালন করেছি! এরপরও তিনি কীভাবে আমাকে এতটা অপমান করতে পারলেন? আমার জীবদ্দশায়ই দ্বিতীয় বিয়ের কথা ভাবতে পারলেন?'

দ্বিতীয় বিয়ের প্রতি তার এই আগ্রহের কারণে বারবার মনে হচ্ছিল, আমি হয়তো খুব বেশি ভালো না, খুব বেশি সুন্দরী না, কাঙ্ক্ষিত মাত্রার অল্পবয়সী না; কিংবা তার জন্য আমি মোটেই যথেষ্ট না! এজন্যই তিনি দ্বিতীয় বিয়ের কথা বলছেন।

কিন্তু আমি তার এই সিদ্ধান্ত কিছুতেই মেনে নিতে পারলাম না। তৎক্ষণাৎ তীব্র প্রতিবাদী কণ্ঠে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলাম—'আপনি চাইলে আরেকটি বিয়ে করতে পারেন। তবে মনে রাখবেন, দ্বিতীয় স্ত্রী ঘরে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমি ঘর ছেড়ে চলে যাবো। অতএব, আপনি যদি অপরিচিত এক নারীর জন্য আমাদের বিয়ে, সন্তান ও জীবনের ঝুঁকি নিতে চান, তাহলে সিদ্ধান্তে অটল থাকুন। আমি কিছুতেই যৌথ দাম্পত্য জীবন সহ্য করতে পারব না।'

[দুই]

মনে হচ্ছে যেন কতকাল আগের কথা বলছি! এমন একসময়ের কথা—যখন আমি ভেবেছিলাম—এ জীবন অনন্তকাল ধরে চলতে থাকবে; কোনোদিনও শেষ হবে না…। যেন কখনো কিচ্ছু বদলে যাবে না; বদলাতে পারে না; কিন্তু অদ্ভুতভাবে সব কিছুই বদলে গেল।

আমার স্বামী অবশ্য দ্বিতীয় বিয়ে করেননি। আমার অনড় অবস্থান আর হুমকিতে তিনি পরাজিত হয়েছেন। আমি জানি না—সেই নারী ও তার বাচ্চাগুলোর শেষ পর্যন্ত কী হয়েছিল। বোধহয়, তারা সবাই অন্য কোনো শহরে চলে যায়। তাদের জন্য একটু কষ্ট ও মায়া হয়েছিল বৈকি!

এরপর আমার স্বামী আর কখনোই দ্বিতীয় বিয়ের কথা মুখে আনেননি। এ কারণে আমিও ভীষণ আনন্দিত। স্ত্রীর জন্য স্বামীকে বুকে আগলে রাখার চেয়ে আনন্দের আর কী হতে পারে! কিন্তু তখনো আমরা কেউ জানতাম না যে, আমাদের সময় খুব শীঘ্রই ফুরিয়ে আসছে…।

একদিন মাগরিবের সালাতের পরে তিনি বললেন—‘খুব মাথা ব্যথা করছে; ইশার সালাত পর্যন্ত শুয়ে থাকব।’ এ কথা বলেই তিনি শুয়ে পড়েন।

কিন্তু হায়! সে রাতে তার আর ইশার সালাত আদায় করা হয়নি। তার সে ঘুম আর ভাঙেনি। সে-রাতেই তিনি মারা যান।

তার আচমকা মৃত্যুতে আমি একেবারেই হতবিহ্বল হয়ে পড়ি! যে-মানুষটার সাথে সারাটা জীবন কাটিয়েছি, সে হঠাৎ করেই পরপারে চলে গেল। এরপর কতকাল ধরে যে তার জন্য কেঁদেছি—তা কেউ জানে না। হয়তো বা এক মহাকাল জুড়ে!

[তিন]

সে-সময় কোনোকিছু দেখাশোনা করে রাখার মতো অবস্থা আমার ছিল না। অযত্নে, অবহেলায় একে একে সব হারাতে শুরু করলাম। প্রথমে আমাদের গাড়ি, এরপর দোকান, এরপর বাড়ি।

শেষমেশ তিন সন্তান-সহ আমি আমার ভাইয়ের বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। হঠাৎ এতগুলো মানুষের উপস্থিতিতে ওদের বাড়িটি গিজগিজ করতে লাগল। আমার ভাবিও

দিনে দিনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিলেন। খুব ইচ্ছে হতো, ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাই। সে-সময় আমার দরকার ছিল একটি চাকরি। কিন্তু আমার কোনো দক্ষতা ছিল না।

এভাবে মানুষের দয়ায় কতদিন পড়ে থাকা যায়? নিজেদের জন্য একটি আলাদা বাসার প্রয়োজন খুব বেশি করে অনুভব করছিলাম।

যখন আমার স্বামী বেঁচে ছিলেন আমরা কত আরামে ছিলাম। ঘরের বাইরে গিয়ে কাজ করার প্রয়োজনই হতো না; কিন্তু তিনি চলে যাওয়ার পরে জীবন এত কঠিন হয়ে গিয়েছিল যে, আমি প্রতিটি দিন তার অভাব বোধ করতাম। হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দনে তাকে অনুভব করতাম। সমস্ত স্মৃতিজুড়ে তাকে খুঁজে বেড়াতাম। কী করে মানুষের জীবন এত ভয়ানকভাবে পাল্টে যায়, তা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ জানে না!

এভাবেই দিন কাটছিল। হঠাৎ একদিন আমার ভাই আমাকে ডেকে তার এক কলিগের কথা বললেন। তিনি বিয়ের জন্য পাত্রী খুঁজছেন। ভালো মানুষ। চমৎকার আচার-ব্যবহার। দ্বীনদারীও প্রশংসনীয়। তিনি চান, আমি তার দ্বিতীয় স্ত্রী হই। আমার জীবনে দ্বিতীয়বারের মতো দ্বিতীয় স্ত্রী কথাটি শুনলাম; কিন্তু এবারের পরিস্থিতি কত ভিন্ন।

একদিন আমার ভাইয়ের বাসায় আমাদের দেখাদেখির ব্যবস্থা হলো। অবিশ্বাস্যভাবে তাকে আমার খুব পছন্দ হয়ে গেল। তার প্রতিটি ব্যাপারই খুব ভালোলাগছিল। তিনি আমাকে বললেন, তার প্রথম স্ত্রী জানেন, তিনি দ্বিতীয় বিয়েতে আগ্রহী। তবে সে এর বিপক্ষে। তিনি এটাও বললেন, দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে একজনকে খুঁজে পেয়েছেন জানলে তার স্ত্রীর প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে সেটি তার জানা নেই; তবে তার স্ত্রীর বহুবিবাহ মেনে নেওয়ার ওপরেই এখন তার চূড়ান্ত জবাব নির্ভর করছে।

সে-রাতে আমি ইস্তিখারা-সালাত আদায় করলাম। আমি পাগলের মতো চাচ্ছিলাম—যেন বিয়ে ঠিক হয়ে যায়। আমার মনে পড়ল, আরেকজন নারীর জীবনও ঠিক এরকম করেই আমার সিদ্ধান্তের ওপরে নির্ভর করছিল। মনে পড়ে গেল, আমি কী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। হঠাৎ করে অনুতাপে পুড়ে যাওয়ার মতো একটি উপলব্ধি হলো।

বারবার মনে হচ্ছিল, আমি আমার জীবনে আরেকজন নারীকে স্থান দিইনি; তাহলে আল্লাহ কেন আমাকে আরেকজন নারীর জীবনে স্থান দেবেন? নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে শাস্তি দেবেন।

আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে থাকলাম। অবাক লাগছিল! জীবনে একবারও আমার মনে হলো না যে, আমি যে-কাজটি করছি তা কতখানি ভুল? আমি সব সময় ভেবে এসেছি—এমন করাটাই ঠিক ছিল।

কিন্তু এখন যখন আমার অবস্থান পাল্টে গেছে, প্রয়োজন যখন এবার আমার, তখন আমি বুঝতে পারলাম, কতটা ভুলে-ই না আমি ছিলাম! আমি আরেকজন নারীর স্বামী-পাবার অধিকার অস্বীকার করেছিলাম।

আমি দুআ করতে থাকলাম, যেন তার স্ত্রী আমায় মেনে নেন...।

কয়েকদিন পরে তিনি আমাকে ফোন করে জানালেন, দ্বিতীয় বিয়ের ব্যাপারটি মেনে নিতে তার স্ত্রীর খুবই কষ্ট হচ্ছে; তবুও তিনি আমার সাথে দেখা করতে আগ্রহী।

[চার]

আজ তার স্ত্রীর সাথে আমার সাক্ষাতের দিন। আমি তার বাসায় ড্রইং রুমে বসে আছি। ভাবছি, দ্বিতীয় বিয়ে বিষয়টি কেমন! কয়েক বছর আগের কথা মনে পড়ে গেল। আমার স্বামীর সাথে আমার বলা কথাগুলো বারবার মনে পড়ছিল—

‘আমি কি খুব খারাপ? আমি কি যথেষ্ট ভালো নই? না, না! আমি কখনোই দ্বিতীয় বিয়ে মানতে পারি না। আপনাকে আরেকজন নারীর সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে পারি না। আপনি চাইলে আরেকটি বিয়ে করতে পারেন। তবে মনে রাখবেন, দ্বিতীয় স্ত্রী ঘরে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমি ঘর ছেড়ে চলে যাবো।’

বসে বসে বোরিং ফিল করছিলাম। খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। আল্লাহর কাছে অনেক দুআ করছিলাম, ‘হে আল্লাহ, আমাকে সাহায্য করুন, তার স্ত্রীর দিলে আপনি রহম পয়দা করুন, সহীহ বুঝ দান করুন। ইত্যাদি..।’

তিনি রুমে এলেন। তার অশ্রু ছলছল চোখ স্পষ্টতই বলছিল যে, তিনি আমার মতোই স্বামী অন্তপ্রাণা একজন নারী। তিনিও আমার মতো তার স্বামীকে খুব ভালোবাসেন। তাকে হারাতে খুব ভয় পান। তিনি আমার হাত দুটি ধরে বললেন, ‘বোন আমার! আপনি যতই অসহায় হোন না কেন, আমার জন্য এটি মেনে নেওয়া যে ভীষণ কঠিন! তারপরও দুআ করি, যেন আমরা দুজন আপন বোনের মতো থাকতে পারি।’

আমি হুহু করে কেঁদে উঠলাম। আমার এই কঠিন সময়ে প্রয়োজন ছিল একটি ভালোবাসাপূর্ণ হৃদয়ের এবং স্নেহমাখা হাতের। যে-হাত আমাকে বুকে জড়িয়ে নেবে এবং যে-ভালোবাসা আমার বেঁচে থাকার ইচ্ছাটিকে বাঁচিয়ে রাখবে। তার স্ত্রীর উদারতায় আমি সেটুকু পেয়ে যাই।

তার স্ত্রী আমার জীবনে এমন একজন নারীর দৃষ্টান্ত, যেমন-নারী আমি নিজে কখনো হতে পারিনি। আমি তার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ। একসময় ভাবতাম, কেউ তার স্বামীকে নিশ্চয়ই আমার মতো করে এত বেশি ভালোবাসে না। কিন্তু তার স্ত্রীকে দেখে ধারণা পাল্টে যায়। এই মানুষটির কাছ থেকেই আমি নিঃস্বার্থ ভালোবাসার আসল পরিচয় জানতে পারি।[১]

[১] একটি বিদেশী গল্প থেকে অনূদিত।